ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চায় শান্তিপুর কলেজ

১৯৪৮ - ১৯৯৮

অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

শান্তিপুর কলেজ ১৯৪৮-এ মাত্র গুটিকয়েক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু, আজ পঞ্চাশ বছরের মাইলস্টোন পেরিয়ে সেই কলেজ সব দিক থেকে জেলার এক অন্যতম উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে অবশ্যই তা কারোর একক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়নি। কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্নে যেমন শান্তিপুরের সুসন্তান পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের নেতৃত্ব তেমনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুণিজন, বিদ্বজ্জন, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও দেশহিতৈষী ব্যক্তির অকৃপণ অবদানের জন্যই ক্রমশ এই প্রতিষ্ঠানটি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে শিক্ষক হিসাবে কলেজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট থাকতে পেরে অবসর সময়ে আজও আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। কাজেই শান্তিপুর কলেজ আমার গর্ব, আমার গৌরব।

বর্তমান শতাব্দীর পাঁচের দশকের শেষদিকে যখন আমি এই কলেজের ছাত্র, তখন কলেজ ছিল ছোট, ছাত্রসংখ্যা সীমিত, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা সেই অনুপাতে আরো নগণ্য। কলেজের পরিবেশ ছিল শান্তিনিকেতনের অনুকরণে ৪৭ বিঘার বিশাল আম্রকুঞ্জ ঘেরা এক মনোরম আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কলেজ-বাড়ি তখন উল্লেখ করার মত নয়। বড় ক্লাস হতো লক্ষ্মীকুঞ্জে, ছোট ছোট ক্লাসগুলি হতো অশোক কুঞ্জ ও হরিতকী বেদীতে। না, কলেজে তখন কোন খেলার মাঠ ছিল না। কিন্তু খেলার মাঠের প্রয়োজনটা সকলে উপলব্ধি করতেন। নিয়মিত না হলেও খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিল। কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন ক্লাবের মাঠে। ছিল হাতে লেখা দেওয়াল পত্রিকা, ছিল কলেজ পত্রিকা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত হতো বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর হতো 'বসন্তোৎসব'। এই উৎসব পরবর্তী কালে বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর, ছয়ের দশকের প্রথমদিকে ক্রমশ কলেজের ছাত্রসংখ্যা বাড়তে থাকে। কলেজের নিজস্ব খেলার মাঠ তৈরির গুরুত্ব বেড়ে যায়। তৎকালীন কলেজ কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছায় খোলা হয় 'শারীর শিক্ষা বিভাগ'। কলেজের অভ্যন্তরে খেলার মাঠ তৈরির পরিকল্পনা ও দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়। বরাদ্দ হয় মাত্র পাঁচ শত টাকা। লক্ষ্মীকুঞ্জকে বাঁচিয়ে প্রায় চল্লিশটি আমগাছ কেটে, একটি বিশাল, গভীর ডোবা ভরাট করে। অন্যদিকে বিশাল এলাকায় কুঁচো ইটের ভিত ও রাবিশ পরিষ্কার করে, সেই সঙ্গে বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করে প্রায় এক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি হয় খেলার মাঠ। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে প্রধান বাধা ছিল অর্থাভাব। সেটাও মিটে যায় সরকারি অনুদানে। আসলে সেই সময় আমাদের কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানটিকে আরো সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রবল ইচ্ছা ছিল। তাই বলা যায় এই 'প্রয়োজনের উপলব্ধি' থাকার জন্যই এই বিশাল কর্মযজ্ঞ দ্রুত শেষ করা সম্ভব হয়।

তারপর সাতের দশক। কলেজের 'শারীর শিক্ষা বিভাগ' তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তিপুরের সীমানা পেরিয়ে জেলা, জেলার বাইরে এমন কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠেও ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্য কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তখন সরকারি অনুদানের সহায়তায় কলেজে স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনার সার্থকতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় স্টেডিয়ামের মালিকানা স্বত্ব প্রসঙ্গ। নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনকে এই মালিকানা স্বত্ব স্বাভাবিক কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ দিতে রাজি না হওয়ায় এই

প্রকল্প না-মঞ্জুর হয়ে যায়। ঠিক একই সময়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ প্রাঙ্গণে 'জিমন্যাসিয়াম' তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করেন। সরকারি অনুদান মঞ্জুর হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। কলেজের তখন প্রচণ্ড অর্থাভাব। অন্য খাতে সেই টাকা খরচ করার জন্য পূর্ব নির্দ্দিষ্ট 'জিমন্যাসিয়াম' আর তৈরি করা যায়নি।

এই কলেজে আমার কর্মজীবনে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখেছে। এমন একটা বছরও যায় নি যে বছর কলেজ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ট্রফিপায় নি। এমন কি CAB, IFA, NDSA ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড পরিচালিত ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, এ্যাথলেটিক মিট, টেবল টেনিস ও যোগাসন প্রতিযোগিতায় বহুবার জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়ে, সারা বাংলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা দেখিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমার নির্দেশনায় অনেকবার আন্তঃকলেজ নাটক, আবৃত্তি, বিতর্ক ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে তারা কলেজের সুনামের প্রতি সুবিচার করেছে। এই স্বল্প পরিসরে কারো নাম উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও বলতেই হয় আমার কর্মজীবনে অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন টীমে যোগদান করে 'ইউনিভার্সিটি ব্লু'-এর মর্যাদা লাভ করেছে। সেই সঙ্গে আমার বহু ছাত্র-ছাত্রী জেলা ও জেলার বাইরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষিকা হিসাবে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

আটের দশকের মধ্যপর্বে আমরা ইউ.জি.সি.-র কাছে ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় ও জিমন্যাসিয়াম তৈরি করার জন্য প্রকল্প জমা দিয়েছিলাম। ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় বাবদ আমরা এক লক্ষ দশ হাজার টাকার অনুদান লাভ করি এবং প্রকল্প অনুযায়ী ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় করাও হয়েছে। বর্তমানে শান্তিপুর কলেজের 'শারীর শিক্ষা বিভাগ' এক স্বয়ংসম্পূর্ণ উল্লেখযোগ্য বিভাগ। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা সংসদ এই কলেজে ডিগ্রী স্তরে 'শারীর শিক্ষা' বিষয়টিকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও কোন আবেদন শিক্ষা দপ্তরে করা হয়নি। এই বিষয় সহ স্নাতক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কর্মজীবনে অনেক সুযোগ রয়েছে। এই কথা মাথায় রেখে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমি কলেজ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে চাই।

বর্তমানে অবসর জীবনে শান্তিপুরের সচেতন নাগরিক হিসাবে যা খবর পাই তা হলো আমাদের এই গর্বের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সার্বিকপরিবেশ আজ নিম্নগামী। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আজ কলেজের শিক্ষার পরিমণ্ডলকে বিঘ্নিত করছে। তাই বলতেই হয় কলেজের শিক্ষাটা শুধু পরীক্ষার হলে প্রশ্নের উত্তর লিখে পাস করা নয়। পাঠক্রমটা একটা অভিজ্ঞতা — বিদ্যাস্থানের অদৃশ্য আলো শিক্ষকদের দৈনন্দিন সান্নিধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে যে চিরস্থায়ী আলোকপাত করবে তা-ই 'শিক্ষা'। শিক্ষার এই তাৎপর্য মাথায় রেখে ছাত্র-সংগঠনের কাজ করা উচিত। আসলে বর্তমান অস্থিরতার যুগে, হতাশায়, অনেক কিছু না পাওয়ার বেদনায় দীর্ণ জীবনকে ভেঙে ফেলার খেলা অনেকে খেলে চলেছেন। ভাঙা সহজ কিন্তু সুন্দরকে আরো সুন্দর রাখার ইচ্ছাই মানুষের জীবনে নিতান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের উপলব্ধি ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে থাকা উচিত। এই আমাদের কলেজ, এই অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের এখানেই পড়াশুনা করতে হবে। এখন যা করা সম্ভব হচ্ছে না বা আমরা যা করতে পারছি না সময় তা পারবে। এক বুক আশা নিয়ে এই প্রতিবেদন এখানেই শেষ করছি।

" খেলা, তুমি শান্তির দিশারী।"

— ব্যারণ পিয়ের দ্য কুবার্তো